বহুমাত্রিক গুণের কবি আসাদ চৌধুরী

রফিক হাসান

১৯৪৩ সালে বরিশালের মেহেন্দিগঞ্জের উলানিয়া জমিদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন আসাদ চৌধুরী।

জমিদার পরিবারে জন্মেও তিনি অতি সাধারণ আটপৌরে জীবনযাপন করতেন।

৫ অক্টোবর কানাডায় পৃথিবীর মায়া ছেড়ে ইহলোকে পাড়ি জমিয়েছেন আসাদ চৌধুরী।

কবি আসাদ চৌধুরী (ফেব্রুয়ারি ১১, ১৯৪৩ - অক্টোবর ৫, ২০২৩)

আসাদ চৌধুরী জন্মেছিলেন জমিদার পরিবারে। কিন্তু জমিদারসুলভ গাম্ভীর্য বা রুঢ়তা কিংবা আভিজাত্যের বড়াই তার আচরণের মধ্যে কখনও দেখা যায়নি। আবার তিনি জীবনের বেশিরভাগ সময় কাটিয়েছেন ঢাকা কিংবা অন্যান্য শহরে। কিন্তু তিনি নাগরিক কবি বলতে যা বোঝায় তা ছিলেন না। মুখে লম্বা দাড়ি, মাথায় ঝাঁকড়া চুল আর পাজামা-পাঞ্জাবি পরিহিত চেহারা সুরতে তাকে দেখে মনে হতো কোনো গ্রামীণ বাউল বা চারণ কবি। অথচ তিনি ছিলেন ষাটের দশকের অন্যতম একজন প্রধান কবি। যে দশকে বাংলা কবিতায় আধুনিকতার উন্মেষ ও বিকাশ ঘটে।

এতগুলো বৈপরিত্য উল্লেখ করলাম সদ্য প্রয়াত কবি আসাদ চৌধুরীর, মোটামুটি একটি চরিত্র বা রূপ সনাক্ত করার উদ্দেশ্যে। এটি আসলে খুবই কঠিন, কারণ আসাদ চৌধুরী নানান অবয়বে নিজেকে তুলে ধরেছেন এবং একটি রহস্যময়তা বজায় রেখেছেন সারা জীবন। কবিতা লেখা ছাড়াও তিনি সাংবাদিকতা করেছেন, অধ্যাপনায়ও নিয়োজিত ছিলেন। দীর্ঘদিন টেলিভিশনে শিল্প, সাহিত্য ও কবিতা বিষয়ক অনুষ্ঠান উপস্থাপনা করেছেন। ভালো আবৃত্তি করতেন। আধুনিক বাংলা কবিতাকে সাধারণ জনগণের কাছে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন সারা জীবন। কথা সাহিত্যে তার অবদান যথেষ্ট। আবার শিশু সাহিত্য ও ছড়ায়ও তার দারুণ দক্ষতা। অর্থাৎ কোনো একটি মাত্র কাজে তিনি নিজেকে আবদ্ধ রাখেননি। নানা সময় নানা কাজে তিনি নিজেকে ব্যাপৃত রেখেছেন এবং উৎকৃষ্ট ফসল ফলিয়েছেন।

জমিদার পরিবারে জন্মেও তিনি অতি সাধারণ আটপৌরে জীবনযাপন করতেন। সারাজীবন শিল্প-সাহিত্য আর জ্ঞানচর্চায় কাটিয়েছেন। ঘুরে বেড়িয়েছেন বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে। বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে সাহিত্য-শিল্পসংক্রান্ত অনুষ্ঠানের দাওয়াত পেলে তিনি ছুটে যেতেন। এরকম নিরহঙ্কার সাদামাটা স্বভাবের মানুষ আজকাল সত্যিই বিরল। ছোট বড় সবাইকে মুহূর্তের মধ্যে আপন করে নিতে পারতেন। বিশেষ করে তরুণ কবি, সাহিত্যিক ও শিল্পীদের তিনি ছিলেন একটি বড় আশ্রয় স্থল। নিজের চেয়ে অন্যকে তুলে ধরতেই তিনি বেশি আনন্দ লাভ করতেন। তার হাত ধরে সাহিত্যাঙ্গনে প্রবেশ করে অনেকে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। এমন উদাহরণ ভুরি ভুরি।

ফলে তাকে একটিমাত্র অভিধায় অভিহিত করা যায় না। আবার আসাদ ভাই নানান গুণে গুণান্বিত একজন সাদা মনের মানুষ ছিলেন। রাগ সঙ্গীতের ভক্ত ছিলেন। নিয়মিত শুনতেন উর্দু হিন্দি গজল। তার মুখে কারো বিরুদ্ধে কখনো কুৎসা বা বিরূপ মন্তব্য করতে শোনা যায়নি। কবি সাহিত্যিকদের নানা কূটকচালির মাঝে তিনি তার নিজস্ব মহিমা বজায় রাখতে পেরেছেন সারাজীবন। মিষ্টভাষী হাসিখুশি ছিলেন সবসময়। খুব যে অর্ন্তমুখী ছিলেন তা-ও নয়। কথা বলেছেন অনর্গল শিল্প সাহিত্য ধর্ম ও বিজ্ঞান নিয়ে।

বাংলা একাডেমিতে তিনি যখন চাকরি করতেন তখন তার রুমে জমজমাট আড্ডা হতো দেশের শীর্ষস্থানীয় কবি, সাহিত্যিক ও শিল্পীদের। আমারও সৌভাগ্য হয়েছে দু'একদিন সেখানে যাওয়ার। সেটা সম্ভবত আশির দশকের শেষ দিকের কথা। আমি সেখানে দেখেছি কবি আল

মাহমুদ, নির্মলেন্দু গুণ, রশীদ হায়দারদের ঘণ্টার পর ঘণ্টা আড্ডা দিতে। আমি তখন ছড়া লিখতাম। বাংলা একাডেমি থেকে বের হতো 'ধানশালিকের দেশ' নামে শিশু-কিশোরদের একটি পত্রিকা। পত্রিকাটি তখন সম্পাদনা করতেন কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন। তার কাছে লেখা জমা দিতে গিয়ে সিঁড়িতে একদিন কবি আসাদ চৌধুরীর সাথে দেখা। আমি তখন একেবারে কিশোর। তবে আসাদ চৌধুরীকে চিনতাম টেলিভিশনে তার অনুষ্ঠান 'প্রচ্ছদ'-এর কারণে। জানতাম তার বাড়ি বরিশাল আর আমার বাড়িও বরিশাল।

আমার বাড়ি বরিশাল শোনার সাথে সাথে তিনি হাত বাড়িয়ে দিলেন এবং আমাকে তার রুমে নিয়ে গেলেন। তারপর টুকটাক কথাবার্তা বললেন। সেই থেকেই আসাদ ভাইয়ের সাথে আমার ঘনিষ্ঠতা। তারপর অনেক অনুষ্ঠানে দেখা হয়েছে, কথা হয়েছে। মাঝে অনেক বছর বিরতির পর আমি জাতীয় প্রেস ক্লাবের সদস্য হওয়ার পর ঘনিষ্ঠতা আবার বাড়ে।

তিনি ক্লাবের সহযোগী সদস্য ছিলেন। বেশিরভাগ সময় ক্যান্টিনে দেখা হতো। প্রেস ক্লাবের কবিতার আসরেও তিনি অতিথি হিসেবে এসেছেন বহুবার। এই গুণী মানুষটি ৫ অক্টোবর পৃথিবীর মায়া ছেড়ে ইহলোকে পাড়ি জমিয়েছেন। শেষ জীবনে তিনি ছেলেমেয়েদের সাথে কানাডায় থাকতেন এবং সেখানেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বাংলাদেশের মাটি ও মানুষের অতি আপনজন এই কবিকে পরিবারের ইচ্ছায় বিদেশের মাটিতে কবর দেওয়া হয়েছে।

কবিতায় তিনি ছিলেন মাটি ও মানুষসংলগ্ন। তিনি প্রচুর পান খেতেন। পান খাওয়াকে তিনি মোটামুটি শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। তার প্রথম কবিতার বইয়ের নামও 'তবক দেওয়া পান'। তার ঝোলার মধ্যে সবসময় পানের বাটা থাকত। সেখানে সুপারি চুনসহ ছোট ছোট কৌটায় নানা মশলা থাকত। মশলা মিশিয়ে তিনি মজা করে পান খেতেন। সেটাও একটা দেখার বিষয় ছিল।

সমসাময়িক ষাটের দশকের অন্যান্য কবিদের থেকে ভিন্ন একটি নিজস্ব স্বর ও ভঙ্গি তিনি আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন। তার কবিতা রফিক আজাদ, নির্মলেন্দু গুণ কিংবা আল মাহমুদের মতো নয়। তিনি নির্মলেন্দু গুণের মতো স্লোগানধর্মী উচ্চকণ্ঠের ছিলেন না। কিংবা রফিক আজাদের মতো পয়ারেও স্নান করতেন না। আবার আল মাহমুদের তিনি গুণগ্রাহী ছিলেন। গুরু বলে ডাকতেন। কিন্তু তার কবিতা আল মাহমুদের মতো নয়। আল মাহমুদের প্রভাব তিনি কাটিয়ে উঠেছিলেন। তিনিও কবিতায় লোকজ শব্দ ব্যবহার করেছেন তবে নিজস্ব ভঙ্গিতে। আল মাহমুদের কবিতায় কুমিল্লা ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ার লোকজ উপাদান ও শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। আর আসাদ চৌধুরী ব্যবহার করেছেন তার জন্মস্থান বরিশালের আঞ্চলিক ভাষা ও লোকজ উপাদান। তবে সেটা অবশ্যই আধুনিক ভঙ্গিতে।

দেশীয়ভাব বা মরমী চেতনার প্রভাবও তার মধ্যে দেখা যায়। একটি কবিতায় তিনি লালনের দেখা পেয়েছিলেন বলে জানান। কবিতার নাম 'বিস্ময় নেই প্রতীক্ষায়'। *লালনের সাথে দেখা হলো আরিচায়/ কুষ্টিয়ায় আমি তাকে কী খোঁজাখুজিই না করলাম/ লালনের কি এখনও ফেরি টেরির অসুবিধা আছে?/*

তবে তার কবিতা সম্পূর্ণ তার নিজস্ব। তিনি গ্রামীণ বা লোকজ উপাদান সমন্বয়ে বৈঠকি ভঙ্গিতে কবিতা লিখতেন। যা পড়ে সহজেই বোঝা যেত এটি আসাদ চৌধুরীর কবিতা। তার কবিতা সংক্ষিপ্ত এবং প্রতীকী। শব্দ ব্যবহারে তিনি ছিলেন খুবই সংযত। অযথা কথার ফুলঝুরি করে তিনি কবিতার মেদ বাড়াননি। তার বিরুদ্ধে গলাবাজি কিংবা অতিকথনের অভিযোগ নেই। তবে শত ব্যস্ততার মাঝেও তিনি কখনও কবিতা লেখা ছেড়ে দেননি। কবিতা লিখেছেন নিয়মিত। শীর্ষস্থানীয় দৈনিক ও সাপ্তাহিকে তার কবিতা মর্যাদা দিয়ে ছাপা হতো নিয়মিত। নিয়মিত কবিতার বইও বের করেছেন। তার অনেক কবিতার বইয়ের একাধিক সংস্করণ হয়েছে।

কবিতায় তিনি অল্প কথায় অনেক কিছু বুঝিয়ে দেন। যেমন তিনি 'আমার স্বদেশ' নামক কবিতায় বলেন: *বুকের মধ্যে প্রবীণ এবং প্রাচীন/ এক নিষিদ্ধ পাখি/ ডানা ঝাপটায়-/বন্ধুগণ, এই আমার স্বদেশ/*

আর একটি তিন লাইনের কবিতার নাম কোপ: *অঙ্গ জ্বলে সাধে?/ কী খোপা বাঁধিয়া দিলি/ নাগর এসে সাধে?/*

চোখ ২ কবিতা: *চোখেই রেখো হাসি/ হয়না যেন বাসী/ সর্বনাশী বলুক লোকে/ চোখে বাজুক বাঁশি।/*

আর একটি কবিতার নাম অভিযোগ: *চুল বেঁধেছি পান খেয়েছি/ ঠোঁট করেছি লাল/ ও শাউড়ী কোন দুঃখে/ দিলি মোরে গাল?/*

এরকম অনেক উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে যেখানে আসাদ চৌধুরী ছোট ছোট কথায় বড় ভাব প্রকাশ করেছেন।

আসাদ চৌধুরী ১৯৪৩ সালে বরিশালের মেহেন্দিগঞ্জের উলানিয়া জমিদার পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন। কিছুদিন ব্রাহ্মণবাড়িয়া কলেজে অধ্যাপনা করেন। তারপর জার্মান রেডিওতে সাংবাদিকতা করেন। এরপর বাংলা একাডেমিতে যোগ দেন এবং সেখান থেকেই অবসর গ্রহণ করেন।

আসাদ চৌধুরী ভালো উর্দু জানতেন এবং বাংলাদেশে থেকেও যারা উর্দুভাষী কিংবা উর্দু কবিতা চর্চা করতেন তিনি তাদের পৃষ্ঠপোষকতা দিতেন। ঢাকার উর্দু কবিদের নিয়ে মাঝে মাঝে মোশায়রা করতেন।

মৃত্যুর পর কবিকে যেখানেই কবর দেওয়া হোক না কেন সেটা বড় ব্যাপার নয়। বড় ব্যাপার হলো তার সৃষ্টিকর্ম। বাংলা সাহিত্য ও শিল্পে আসাদ চৌধুরী যে অবদান রেখে গেছেন তা সহজে মুছে যাওয়ার নয়। কয়েক খণ্ডে তার কবিতা সমগ্র প্রকাশিত হয়েছে কবি হাসান হাফিজের সম্পাদনায়। ভবিষ্যত প্রজন্ম সেখান থেকেই তাদের কবিতা লেখার উপাদান ও প্রেরণা পাবেন। বাংলা সাহিত্যে নিজস্ব ঢংয়ের একজন শক্তিমান কবি হিসেবে তিনি টিকে থাকবেন বহুকাল।